৮ অন্ধকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

"Deep into that darkness peering,long I stood there,wondering,fearing,doubting,dreaming dreams no mortal ever dared to dream before."

-Edgar Allan Poe

অন্ধকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহের গভীরতা অপরিমেয়। যবে থেকে মানবজাতি আলোকে বুঝতে শিখেছে ঠিক তবে থেকেই অন্ধকারের প্রতি তাদের আগ্রহের শুরু। অজানাকে জানার অদম্য ইচ্ছেতে আঁধারময় অন্ধকূপে নিজেদের নিমজ্জিত করার লোভও সামলাতে পারেননি এরকম উদাহরণও নেহাত কম নেই।

তবে অন্ধকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বেশ কিছু চিন্তা-ধারণা এমন রয়েছে যা রীতিমত ভ্রান্ত। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন যেখানে আলো আছে সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, অন্ধকারকে মুছে ফেলাতেই আলোর উপযোগিতা। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা একেবারে অন্যরকম।

অন্ধকারের উপস্থিতির জন্য কোনও আধার বা পরিবেশের প্রয়োজন হয় না। যেখানে আলোকজ্বল ইতিবাচক শক্তি বিরাজ করে ঠিক সেখানেই উপস্থিত থাকে ঘন মিশকালো অন্ধকারের শক্তিরা। আমাদের মনের ভিতরের এক গোপন কুঠুরিতে থেকে, সমস্ত রকম পরিচিতর নজর এড়িয়ে নিজেকে গোপন করার কৌশল আঁধারের জানা আছে। অন্ধকারকে উপলব্ধি করা যায় তখনই যখন নিজেকে তার মধ্যে বিনা বাধায় নিমজ্জিত করে ফেলা যায়।

আঁধারময় শক্তি মানেই শুধু তন্ত্র, মন্ত্র, কালো জাদু, ডাকিনীবিদ্যা নয়। সেই শক্তিকে চেনার ক্ষমতা কতিপয় জীবিত প্রাণীর হয়েছে, কিন্তু তার পরিণতি হয়েছে মর্মান্তিক। অন্ধকারকে চিনতে পারার পর হয় তারা পরিণত হয়েছেন বদ্ধ উন্মাদে নয়ত আজীবন ভুগেছেন এই দ্বিধায় যে তারা যা বুঝেছেন, যাকে উপলব্ধি করেছেন তার সঠিক সংজ্ঞাটা ঠিক কী! অন্ধকার, অশুভ নাকি তার

থেকেও ভয়ানক কিছু ! ‘

‘আট অন্ধকার’ এমন কয়েকটি অন্ধকারময় গল্পের সংকলন যাদের সন্ধান চালানো হয়েছে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে। গল্পগুলিকে নির্বাচন করার সময় লেখক লেখিকাদের নামের ভারের চেয়ে, লেখনীর ভারকে গুরুত্ব দেওয়ার দরুণ বাতিল করতে হয়েছে অনেক সুপরিচিত ব্যক্তির নিরলস পরিশ্রমকে।

নিছক একটি থ্রিলার সংকলন করার উদ্যেশ্যে আট অন্ধকারের নির্মাণ করা হয়নি, আট অন্ধকার পাঠক পাঠিকাকে দিতে পারে এমন আটটি অন্ধকারময় অভিজ্ঞতা যা তাদের মনের গভীরে ছেড়ে যাবে তার চিরন্তন ছাপ,যা বহুদিন পরেও মনে করিয়ে যাবে সেই অমোঘ সত্য

‘অন্ধকারের বিনাশ নেই, এমনকি অন্ধকার নিজেও নিজের বিনাশ ঘটাতে অক্ষম’

সূচিপত্র

কালচক্রের আবর্ত	দেবদত্তা ব্যানার্জি	১১
কাইটুন	পল্লব বসু	২৫
মন্দির দ্বীপের গুপ্তধন	প্রদীপ কুমার বিশ্বাস	৩৩
আঁধার	মণীষ মুখোপাধ্যায়	৫১
মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গলে	প্রীতি দাস	৬৮
প্র্যাকটিকাল খাতা	ঋতুপর্ণা চক্রবর্তী	৮৭
সেই গাছটা	বৈশালী দাশগুপ্ত নন্দী	১০১
কারা শেহর	প্রতিম দাস	১১১

কালচক্রের আবর্ত

দেবদত্তা ব্যানার্জি

ট্রান্সফারের মেলটা পেয়েই আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল। দোমহনী, তিস্তার পাড়ে গড়ে ওঠা এক ছোট্ট সুন্দর জনপদ। যেখানে কেটেছিল আমার ছেলেবেলার কিছুটা সময়, তারপর হঠাৎ আমরা বালুরঘাট চলে যাই। বহুবার ভেবেছি দোমহনী যাব কিন্তু আর যাওয়া হয়নি বিভিন্ন কারণে। অবশ্য কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাবা মা আমায় দোমহনী যেতেই দিতে চাইত না। আসলে ছোটবেলায় একবার আমার খুব অসুখ করেছিল। শুনেছি অনেক ডাক্তার দেখিয়েও আমি সুস্থ হইনি যখন, তখন মা বাবা আমাকে এক অঘোরী তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যায়। তিনি কী সব পুজো টুজো করে বাবাকে বলেছিলেন দোমহনী ছেড়ে দিলেই আমি বেঁচে যাব। আমার খারাপ হাওয়া লেগেছে। বাবা রাতারাতি আমাদের নিয়ে বালুরঘাটে মামাবাড়ি চলে এসেছিল। তারপর থেকে আর দোমহনী যাইনি আমরা কেউ।

গ্রামীন ব্যাঙ্কে চাকরী পেয়ে দুবছর ইসলামপুরে ছিলাম। ঋদ্ধির সঙ্গে পরিচয়ও এই ইসলামপুরে এসে। এরপর তিন বছর হিলিতে তিন বছর রায়গঞ্জে কাটিয়ে আবার প্রমোশন এবং বদলি। এবার গন্তব্য দোমহনী দেখেই মন আনন্দে নেচে উঠল।

মা গত হয়েছেন ছমাস আগে, বাবা দুবছর আগেই চলে গেছিলেন। আজ ওঁরা থাকলে খুব খুশি হতেন। বাবার জীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছিল দোমহনীতে। শুনেছি দাদু রেলে চাকরি করতেন। এনজেপি স্টেশন হওয়ার আগে দোমহনী ছিল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় জংশন। কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ আর আসামকে জুড়েছিল এই প্রাচীন জনপদ। বড় বড় রেলের অফিসারদের বাংলো আর বিশাল ইয়ার্ড আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের সাক্ষীর মত। আমি অবশ্য যে দোমহনীকে দেখেছি তা এক শ্মশান সদৃশ গ্রাম। কঙ্কালের মত বড় বড় লাল ইটের বাংলো চারদিকে ছড়ানো, মৃতপ্রায় রেল লাইন যা দিয়ে সারাদিনে মাত্র একবার ধুঁকে ধুঁকে চলত মাত্র দুকামরার একটি মিটারগেজ ট্রেন। রামসাই ফরেস্টের চোরাই কাঠ পাচার হতো ঐ ট্রেনে। তারপর বসে গেছিল সেই কয়লার ইঞ্জিনে টানা প্রাগৈতিহাসিক ট্রেনটা। ছোটবেলা ঐ রেললাইনেই খেলতে যেতাম আমরা, পাশেই সাহেব বাংলো, বিশাল লাল ইটের এক ভগ্নপ্রায় বাংলো, সেই বাউন্ডারির ভেতর বিশাল

বাগান, পেয়ারা, আম, লিচু, কী নেই সে বাগানে। আর ছিল দেওয়াল ঘেঁষা একটা শিউলি গাছ, বারো মাস যে গাছে ফুল হত। লোকে ঐ বাংলোকে পোড়া সাহেবের বাংলো বলত। সাহেবকে নাকি অভিশাপ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল কোন তান্ত্রিক। ভূতের ভয়ে কেউ যেত না ওর ভেতরে। বাইরে থেকেই ফল চুরি করত। কিন্তু আমি একদিন রুবেলের সঙ্গে ঢুকেছিলাম ফল চুরি করতে। পরিত্যক্ত বাংলোর বাগান আগাছায় ভরা হলেও একটা পায়ে চলা হাঁটা পথ ছিল বাগানের ভেতর দিয়ে। যা শেষ হয়েছিল বাংলোর সিঁড়ির কাছে। সাদা থোকা থোকা জামরুল পেড়ে খেয়েছিলাম। তারপর অলস দুপুরে মাঝে মাঝেই ঐ সাহেব বাংলো আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতো। সোনালী হয়ে পেকে থাকা আতা, লালচে লিচু, সিঁদুরে আম... বেশ ভালোই কাটছিল দুপুরগুলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন কী যে হল, প্রথমে রুবেল তারপর আমি পড়লাম এক অজানা জ্বরের কবলে, শুকিয়ে যেতে লাগলাম দিন দিন, ফ্যাকাশে রক্ত শূন্য হয়ে উঠছিলাম। এক সন্ধ্যায় খবর এলো রুবেল আর নেই। তারপরেই বাবা-মা বাবার এক বন্ধুর কথায় আমায় নিয়ে ছুটেছিল অঘোরী বাবার থানে। আমার অবশ্য কিছুই মনে নেই।

এরপর আমরা সব ছেড়ে রাতারাতি বালুরঘাট চলে এসেছিলাম। বাবা স্কুলের সরকারী চাকরি, পৈতৃক বিশাল বাড়ি সব ফেলে চলে এসেছিল আমাদের নিয়ে। পরে অবশ্য ছোটকাকা আর মেজোকাকা গিয়ে বাড়ি-ঘর নামমাত্র দামে বিক্রি করে এসেছিল। আজ প্রায় তিরিশ বছর পর আবার সেই দোমহনী যাব ভেবেই একটা রোমাঞ্চ হচ্ছিল মনের ভেতর। আমার ছোটবেলার খেলার সাথীরা আজ কে কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে।

বাড়ি ফিরেই ঋদ্ধিকে বললাম, "আমি পরশু রবিবার চলে যাব। জয়েন করে বাড়ি খুঁজে কিছুদিনের ভেতর তোমায় আর পালককে নিয়ে যাবো।" পালক আমাদের পাঁচ বছরের মেয়ে।

ঋদ্ধি একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, "সেই দোমহনী! মা বাবা তোমায় নিয়ে চলে এসেছিল। সেখানে যাওয়া কি উচিত হবে?"

"তুমি না সাইন্স নিয়ে পড়েছ? তিরিশ বছর আগে কে কী বলেছিল যা শুনে বাবা-মা চলে এসেছিল তা ধরে বসে থাকব আমরা! এ যুগে বসে এসব কি তোমার মুখে মানায়?"

ও আমায় জলখাবার দিয়ে বলল, "তবে জায়গাটা তো গ্রাম, মেয়ের পড়াশোনার কী হবে ভেবেছ?"

"পাশেই জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ভালো ভালো স্কুল রয়েছে। ওসব ভেবে দেখার সময় পাব প্রচুর। আমার ব্যাগটা গুছিয়ে রেখো।"

কাইটুন

পল্লব বসু

কে বলবে তাঁর তত্ত্বাবধানে ছয়জন রিসার্চ স্কলার কাজ করছে, রসায়নের যে কোন বিষয়ে তাঁর সাবলীল বিচরণ! ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে আড়ালে রসায়নের ইন্দু মানে চাঁদ বলে ডাকে, সেই মানুষটা ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে একেবারে সদ্য গোঁফ ওঠা কিশোরে পরিণত হয়ে যান। ইন্দ্রনীল উৎসেচকের কাঁচি দিয়ে ডিএনএ কাটাছেঁড়ায় যেমন সাবলীল, তেমনই ঘরে বসে কাগজ, প্ল্যাস্টিক কেটে নতুন নতুন নকশার ঘুড়ি বানানোয়ও তেমনই উৎসাহী। সাথে সম উদ্যমের সঙ্গী পেয়েছেন প্রতিবেশী অমিত আর অম্লানকে। গতকাল বানিয়েছেন ডেল্টা ঘুড়ি। ডায়মন্ড আকারের যে ঘুড়িগুলো আমরা সাধারণত দেখি, এর চেহারাটা তার থেকে একটু আলাদা। ঘুড়ির উপরে দুটো চোখও এঁকে দিয়েছেন। প্রত্যেক রবিবার বিকেলবেলা সাড়ে তিনটে চারটে থেকে বরানগরের ন'পাড়ায় পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ির কিছু অসমবয়সী মানুষ ঘুড়ি ওড়ানোয় মেতে ওঠেন, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

অম্লানের সঙ্গে অমিতের সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে অনেকক্ষণ থেকে। ইন্দ্রনীল ঝাঁপিয়েছেন তাঁর ডেল্টা ঘুড়ি নিয়ে দূরের একটা ঘুড়ির সাথে প্যাঁচে। এর মধ্যেই চোখের কোণ দিয়ে নজরে এল অম্লানের ড্রাগন আকৃতির ঘুড়িটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উড়তে উড়তে গিয়ে বিদ্যুতের তারে লটকে গেল। নিশ্চিত অমিত কেটেছে ঘুড়িটা। ইন্দ্রনীল আবার প্যাঁচ কষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কারণ একটু অন্যমনস্ক হলেই নিজেরও ওই দশা হতে পারে।

****

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা, আমি বাড়ি ফেরার তোড়জোড় করছি, টেবিলের ফোনটা বেজে উঠলো,

"হ্যালো, আইসি শ্রীপর্ণা হেয়ার?"

"ম্যাডাম, আমি অমিত, ন'পাড়ায় থাকি।"

"কী ব্যাপার?"

"আমাদের প্রতিবেশী ইন্দ্রজ্যেঠু আর আমি বিকেলে, পাশাপাশি ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম। বিকেল পাঁচটায় টিউশান পড়তে চলে যাই। সাড়ে সাতটার

সময় বাড়ি ফেরার পথে ইন্দ্রজ্যেঠুর বাড়িতে কলিংবেল বাজাই। যেদিনগুলো টিউশান থাকে, ফিরে এসে জ্যেঠুর সাথে ফোনে বা কখনও ওঁর বাড়ি গিয়ে হাল্কা আড্ডা দিয়ে একটু রিল্যাক্স করি। কিন্তু আজ বহুবার কলিংবেল বাজিয়েও যখন উনি দরজা খুললেন না, ভাবলাম হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুড়ি-লাটাই ছাদে পড়েছিল, সেগুলো নিতে এসে ছাদ থেকেই ইন্দ্রজ্যেঠুকে ফোন করি। তখনই ওঁর ছাদ থেকে আলোর ঝলক আর মোবাইলের পরিচিত রিংটোন ভেসে আসে, অথচ ছাদের কোথাও ওঁকে চোখে পড়ে না। একটা লম্বা টুল ছাদে নিয়ে এসে, তাতে উঠে ওনার ছাদে আলো ফেলে এখন দেখছি...”

।।২।।

রাত আটটা বাইশে ইন্দ্রনীলবাবুর বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকলাম। ছাদ থেকে ওঁর চারপাশের মানচিত্রটা এরকম, ওঁর বাড়ির পুবদিকে রাস্তা চলে গেছে সোজা নোয়াপাড়া পোস্ট-অফিস হয়ে ক্যান্টনমেন্ট, পশ্চিমদিকে কিছু ব্যবধানে সঙ্গীত শিক্ষক অমল সোমের বাড়ি, উত্তরে বাড়ির গা ঘেঁষে প্রেসিডেন্সীর রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক অম্লান পালের আর দক্ষিণে অমিতদের বাড়ি। ছাদের দরজার একটু দূরে, অমিতদের বাড়ির দিকে পা, অম্লানবাবুর বাড়ির দিকে মাথা, চিৎ হয়ে পড়ে প্রেসিডেন্সীর রসায়নের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল সেন, হাতে ঘুড়ির সুতো, ঘুড়িটা ছাদে টাঙানো দড়িতে আটকে। ইন্দ্রবাবুর শরীরের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। ছাদের মেঝেতে খানিকটা বমি শুকিয়ে আছে, যা ইন্দ্রনীলের জামায়ও লেগে। শব্দ, বর্ণ, গন্ধ এইগুলো সর্বদা রহস্যভেদে আমায় সাহায্য করে। একটু ভাল করে ঘ্রাণ নিতেই ইন্দ্রনীলের শরীর থেকে, আমার নাকে এসে লাগল হালকা ‘আমন্ড বাদামের’ গন্ধ। ছাদের উপরে একটা ছোট্ট টেবিল আর চেয়ার পাতা রয়েছে। টেবিলের উপরে একটা কফি মাগ, ফ্লাস্ক আর মোবাইল ফোন। কাপের নীচে কফির তলানি, সামান্য কফি পড়ে আছে ফ্লাস্কে। মৃতের পায়ে হাওয়াই চটি, হাতে হাতঘড়ি, পরনে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা।

।।৩।।

আজ অবধি নাক আমায় সহজে ধোঁকা দেয়নি, সেটা আজ বুধবার সক্কালবেলা, অটপ্সি রিপোর্ট হাতে পেয়েই বুঝলাম। অনুমান মতোই, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর প্রধান কারণ পেলাম, সায়ানাইডের বিষক্রিয়া, মৃত্যুর সম্ভাব্য সময়, বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, শরীরে ধ্বস্তাধ্বস্তির কোন চিহ্ন নেই। অকৃতদার

মন্দির দ্বীপের গুপ্তধন
প্রদীপ কুমার বিশ্বাস

এইবার সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে, দু'তিন দিনেই প্রতিটা বোটের কোল্ড-স্টোর প্রায় ভর্তি। ফেরার পথে, রেড স্ন্যাপারের একটা বড়ো দল দেখতে পেয়ে, পাঁচটা বোটের আমরা সবাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না। একটু পরেই পুবের আকাশে বেশ কয়েকটা কালো মেঘকে কাছাকাছি আসতে দেখে আর তার সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের ঝলকানি দেখে, একে অন্যকে সতর্ক করে নিজের নিজের বোট আর জালের অংশ সামলাবার কাজে লেগে পড়লাম।

ট্রলের সময়, আমার সঙ্গী আন্টানিওর, নোঙ্গরের ধাক্কায় চোট লেগেছে। ওকে লোয়ার ডেকে রেখে আমি দৌড়ালাম আপার ডেকের ফ্লাই ব্রিজে। সেখানে আসতে না আসতেই উঠলো ঝড় আর বিদ্যুৎচমক দিয়ে মেঘগর্জনের সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি। বড়বড় ঢেউ যেন হামলে পড়ছে বোটটার ওপর। নতুন তৈরি এই পাওয়ার বোটটা দারুণ শক্তিশালী। অন্য বোট হলে, এই সব ঝামেলায় পড়ে মোচার খোলার মতো দুলত।

আমাদের পাহারার জন্য প্রাইভেট গার্ড কোম্পানি 'মিলিশিয়া'-র যে বোটটা সঙ্গে আছে, আজই সন্ধ্যায় এই বোটের ফুয়েল, খাদ্য সামগ্রী আর পানীয় জল তার পৌঁছে দেবার কথা। হঠাৎ করে আসা ঝড়-জলের এই ঝামেলায় পড়ে, সে এখন কোথায় কে জানে? বেশ কয়েকটা ঢেউ কাটাতে গিয়ে দেখি, অটো-রাডার আর ন্যাভিগেশন সিস্টেম কাজ করছে না, সেইসঙ্গে রেডিও ট্রান্সমিটার আর রিসিভারও। আমাদের দলের একটাও বোটকে দেখতে বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না। আমরা কি তবে ঢেউয়ের ঠেলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম দল থেকে?

ড্যাশ বোর্ডের প্যানেল বলছে, ফুয়েল এখন রিজার্ভের কাছাকাছি। বড়জোর রাতটুকু চলতে পারে। এরপর বন্ধ হয়ে যাবে ইঞ্জিন আর পাম্প। সমুদ্রের ঢেউয়ের মর্জিমাফিক খামখেয়ালি দিকে চলবে বোট। অকেজো অটোরাডার আর পাম্পের জন্য, মহাসমুদ্রের ঢেউ যদি আমাদের বোটকে টেনে নিয়ে যায়, ঢেউয়ের ওঠানামাতেই জলে ভরে গিয়ে জল-সমাধি হবে বোটের সঙ্গে আমাদেরও। ওয়াকিটকিতে আন্টানিওকে ডেকে-ডেকেও সাড়া পাচ্ছি না। জাহাজের এই অবস্থায় ও চুপ করে আছে কেন? এখন যা অবস্থা তাতে ফ্লাই ব্রিজ ছেড়ে আমি কোথাও যেতেও পারছি না।

ঘণ্টা দুই পরে সমুদ্র একটু শান্ত হল। ফ্লাই-ব্রিজ থেকে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে যে সূর্যদেব বিদায় নিচ্ছেন সেদিনের মত। এটা এখন ধরে নিয়েছি যে আমরা এখন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। একটু ঝুঁকি নিয়ে লোয়ার ডেকে গিয়ে দেখি, কন্ট্রোল প্যানেল রুমের দরজার কাছে, আন্টানিও অচেতন হয়ে ভূমিশয্যায়, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু আগে নোঙ্গরে চোট লেগে, সংক্রমণ হয়ে এই কাণ্ড হয়েছে। কোনওমতে জলের ছিটে দিয়ে শুশ্রূষা করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে, কন্ট্রোল রুমে রাখা মেডিক্যাল বক্স আনতে গিয়ে দেখি, ঝড়ের দাপটে দুটো পোর্ট-হোল খুলে গিয়ে ইঞ্জিন রুম জলে ভাসছে। সেই জলে ডুবে গিয়ে কম্পিউটার, জি পি এস, রেডিও ট্রান্সমিটার, মেরিনার কম্পাস অর্থাৎ পুরো ন্যাভিগেশন সিস্টেমটাই অচল হয়ে গেছে। সূর্যের উদয়-অস্তের দিক ছাড়া আর কোনোভাবেই দিকনির্দেশ জানবার উপায় নেই। স্টোররুমে পুরো রেশন আর পানীয় জলের জ্যারিকেনগুলো জলে প্রায় ডুবে আছে। আইসবক্স অচল, এত কষ্টে ধরা মাছগুলো, প্রায় পচতে শুরু করেছে। মেডিক্যাল বক্সটি অক্ষুণ্ণ আছে। এ থেকে ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়ে কোনওমতে আন্টানিওকে ফ্লাই ব্রিজের ককপিটে নিয়ে এলাম। ওকে এইখানে শুইয়ে দিয়ে আমি ম্যানুয়াল রাডার আর স্টিয়ারিং হুইল সামলাতে থাকলাম।

চার দিন কেটে গেছে, সমুদ্রে তুফান শুধু কাল বন্ধ হয়েছে। ঘন মেঘে, আকাশ সূর্যকে ঢেকে রাখলেও, দিন-রাতের ফারাকটা বোঝা যায়। এই চার দিনে, আমাদের সঙ্গী বোটগুলোর বা অন্য কোনও বোটের যেমন দেখা নেই তেমনই নেভির কোনও টহলদারি বোটকেও দেখা যায়নি। কাল বিকেলে নেভির একটা সি-প্লেনকে দেখা গেছিল। আমার লাল শার্ট দিয়ে এস ও এস সিগনাল পাঠাবার একটা ব্যর্থ প্রয়াসও করেছিলাম।

আন্টানিও সেরে উঠছে কিন্তু ও এখন খুব দুর্বল। ওর অজান্তে এই কদিন, তিনটে টিন ফুডের পুরোটাই ওকে খাইয়েছি। বাকি একটাতে আমি কোনওরকমে চালিয়েছি। কাল ঢেউয়ের জলের সঙ্গে একটা মাছ লোয়ার ডেকে আটকে গেছিল। ক্ষুধার্ত জঠরের করুণ আবেদনে, সেই মাছ পুড়িয়ে খাওয়া হয়েছিল। আজ সন্ধেতে সেই মাছ পোড়ার অবশিষ্টাংশ আর শেষ জলের বোতলের তলানিটুকু দুই বন্ধুতে শেষ করে আপার ডেকে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে দু'জনেরই এক প্রশ্ন, এর পর কী?

আমি কয়েকবার এই কথা ভাবতে-ভাবতে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। একটা জোর ঠেলা খেয়ে, বহুকষ্টে চোখ খুলে দেখি, অনেকদিন পর রোদ উঠেছে। ডেকের রেলিং ঘেঁষে আন্টানিও দাঁড়িয়ে আছে আর দূরে একটা সিগ্যাল কাঁ-কাঁ করছে। আন্টানিও পাখিটার দিকে আঙ্গুল দেখাতেই, সেটা উড়ে গেল। পাখিটাকে দেখে মনে হচ্ছে, দ্বীপ কাছেই আছে। আনন্দ একটু

আঁধার

মনীষ মুখোপাধ্যায়

আমার ছোড়দাদুর বাড়ি ছিল বা বাড়ি হলো বইকুলা, বনগাঁর ছোট্ট একটা গ্রাম। এই ছোট্ট গ্রামটার আবার গাল ভরা নাম আছে, 'বেড়বাড়ি'। অর্থাৎ সংরক্ষিত গৃহ। কে সংরক্ষণের নিয়ম ভাঙবে ওই শেয়াল ডাকা গ্রামে কে জানে? তা যাই হোক, ছোড়দাদু মারা গেছেন তাও প্রায় দশ বছর হলো, তারপর ওই বাড়িতে একা থাকত ডাবু কাকা, মানে আমার ছোট কাকা, ছোড়দাদুর ছেলে শ্রী গোপাল চ্যাটার্জী। ছোড়দাদু মারা যাওয়ার পর ডাবু কাকার কিছু অদ্ভুত শখ হল, গ্রামের লোকে বলত নাকি কী সব তান্ত্রিক শিক্ষা-টিক্ষা নিয়ে লোকের রোগ ভোগ সারাত। এমন কী কুকুরের কামড় সাপের বিষ সবেরই চিকিৎসা করত সে আর সারা রাত শ্মশান মশান ঘুরে কীসব সাধনা টাধনাও করত। আমার বাবা কলকাতায় তার কাজের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত থাকায় বারবার গ্রামে যাওয়া হয়ে উঠত না। কাকা থাকত তার সাধনা নিয়ে। তার সাথে অন্যান্য আত্মীয়দের যোগাযোগও কমে গেল। কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া প্রায় দেখাই হতো না বলা যায়।

ডিসেম্বর মাসের এক সকাল বেলা হঠাৎ বাবার কাছে বনগাঁ সদর থানা থেকে ফোন এল, ওখানকার ওসি জানালেন, "আপনার খুড়তুতো ভাই কাল রাতে মারা গেছেন।"

শুনে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। বাড়ির পরিবেশ থমথমে। ছোটবেলার কথা মনে পড়তে লাগল। আমি আর ডাবু কাকা কত মাছ ধরেছি, আম পেড়েছি একসঙ্গে। গাছে চড়া, সাইকেল শেখা, ডুব সাঁতার দেওয়া আরও কত কী! খুব কান্না পেল, কী আর করার! যে গেছে সে গেছে। অবিবাহিত লোক তাও ছোড়দাদুর যা সম্পত্তি ছিল তা দিয়েই তো ওর সারা জীবন চলে যেত, হঠাৎ মারা গেলই বা কী করে? চিন্তাটা যেন গিলে খেতে এল আমায়।

বাবাও একই প্রশ্ন করল ওসি সাহেবকে যে তার ভাই মারা গেল কী ভাবে? ওসি সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন, স্যার বুঝতে পারা যাচ্ছে না, ব্যাপারটা রহস্যজনক। এটা খুন না আত্মহত্যা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মানে উপায় নেই বোঝার। আপনারা দয়া করে এসে যদি লাশ শনাক্ত করে দেন, তাহলে ময়না তদন্তের জন্য বডি পাঠাতে পারি। তারপর আপনারা সৎকারের জন্য বডি পেয়ে যাবেন।

বাবা, আমি, আর বাড়ির চাকর নিবারণদাদা বেড়িয়ে পড়লাম বনগাঁর উদ্দেশে। দমদম থেকে লোকাল ট্রেন ধরলাম। দুপুর দুটোর মধ্যে আমরা বনগাঁ থানা পৌঁছে গেলাম। এক দু'জনকে জিজ্ঞেস করার পর অবশেষে ডিউটি অফিসার শশীকান্ত দাসের সাথে আমাদের দেখা হল। ওরাই নিয়ে গিয়ে ডাবু কাকার লাশ শনাক্ত করাল ঘন্টা খানেকের মধ্যে।

কী ভয়ানক আকার নিয়েছে লাশটা, শরীর রক্তশূন্য হয়ে গেছে, কান দুটো নেতিয়ে গেছে, মুখ ফ্যাকাসে, চোখ দুটো যেন বাইরে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে ভয়ে। এ চেহারা দেখলে অনেক সাহসী শের খানও তিন রাত ঘুমাবে না। ঠোঁটের কশ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গালে জমে আছে, শরীরের যেটুকু অংশ দেখা গেল সবই শুকিয়ে কাঠ। নারকীয় ব্যাপার! যদি খুন হয়, তবে এত পৈশাচিক হত্যা কে করল! আর যদি আত্মহত্যাই হয়, তবে এ ভাবে কি সেটা করা সম্ভব? প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে জট পাকাতে থাকল।

পুলিশ বডি হ্যান্ড ওভার দিতে দিতে অনেকটাই রাত করে ফেলল। তাও পাওয়া যেত না, বাবা নেতা টেতাদের ফোন লাগিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জোগাড়যন্ত্র না করলে হয়েছিল কম্মো। এবার সমস্যায় পড়তে হলো আরও। গ্রামের দুচারজন মত্ত জোয়ান ছাড়া লাশ শ্মশান অবধি নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া যায় না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনও ফল হওয়ার নয় দেখে যাদের পাওয়া গেল তাদের নিয়েই শ্মশানের পথ ধরলাম আমরা। অবশেষে জনা ছয় সাতেক লোক মিলে "বলো হরি, হরি বোল" করতে করতে আমরা শ্মশানে পৌঁছলাম। বাবা দলপতি সুলভ হাবভাব নিয়ে হুকুম দিলেন, চ্যাটার্জ্জী বাড়ির ছেলের যেন নিয়ম নিষ্ঠা মেনে দাহ সংস্কার হয়।

আমরা দুটো দলে ভাগ হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। এক দলের কাজ হল শ্মশান সামগ্রী জোগাড় করে আনা। মানে কাঠ, ঘি, পাটকাঠি, ছ্যাচারি এসব আনা। আর আমি আর বকুল বলে একটি ছেলে গেলাম পুরোহিত আর ডোম ডেকে আনতে। এত রাতে সব ভাগলবা, তায় আবার শীতের রাত। সমস্যা আরও বড় আকার নিল যখন দেখলাম, পুরুত পাই তো ডোম পাই না, ডোম পাই তো পুরুত পাই না। যাও একজনকে পাওয়া গেল, অপঘাতে মরেছে শুনে সেও পগারপার। আর গ্রামের দিকে রাত বাড়লে চাইলেই এদের পাওয়া যায় না। শেষে ডবল টাকার লোভ দেখিয়ে এক চক্কোত্তি ব্রাহ্মণ কে রাজি করালাম আমরা সাথে একটা বোতল ফ্রি। এবার হল ডোমের পালা। সে মোটামুটি রাজি, তবে তার নেশা কেটে গেছে তাই নতুন বোতল লাগবে। তাকে তাই দেওয়া হলো। এসব ঝামেলা পুইয়ে যখন শ্মশানে ফিরলাম প্রায় রাত দেড়টা। সেখানে এসে দেখি আর এক যন্ত্রণা। পোড়াবার কাঠ ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে, আগুন করে তা শোকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। একটা মরা পোড়াতে যে কত সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে লিখে ফেলা যায় একটা গোটা বই।

মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনে
প্রীতি দাস

জিপ ছুটে চলেছে পাকিস্তানের কারাকোরাম হাইওয়ে ধরে। আসলে এটি হাইওয়ে নয়। বরং জিপ যাওয়ার উপযোগী সংকীর্ণ এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। চারিদিকে ধূসরতায় ক্লান্ত চোখ মুদে কিম্বার্লে ঝিমোচ্ছিল। উইলিয়াম পুরানো এক স্থানীয় ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতায় মনোযোগ দিয়েছে।

সেই কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে লেখা আর্টিকেল। দুই দেশ কোন এককালে এক বিশাল ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল, আর আজ সামান্য এক ভূমির টুকরো নিয়ে মারামারি! বিরক্ত হয়ে উইলিয়ামও এক সময় চোখ মুদল। প্রায় পাচঁশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলল তারা এই পথে। পুরো পথ জুড়ে ধূসর, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি। ক্রমাগত ধুলোর ঝাপটায় তাদের সাদা চামড়ার বর্ণও এখন ধূসর।

হঠাৎ কিম্বার্লের উল্লাসে ঝিমুনি কেটে গেল উইলিয়ামের।

"বাঃ, কী অপূর্ব জায়গা এটা!"

উইলিয়াম তাকিয়ে দেখল স্কার্দু এসে গেছে। মরূদ্যান বলা যায় একে। পাহাড়, নদী, আর ছোট ছোট গাছপালা সমৃদ্ধ এক সুন্দর শহর স্কার্দু।

জিপকে বিদায় দিয়ে নেমে পড়ল তারা।

স্থানীয় আর একটি জিপ ভাড়া নিয়ে চলল আসকোলের উদ্দেশ্যে।

রাস্তা বীভৎস রকম খারাপ। খণ্ড খণ্ড পাথর ও মাটির ডেলা প্রমান দেয় যে এই পথ ধসপ্রবণ। একদিকে খাড়াই পাহাড় আর অন্য দিকে ব্রালডু নদী বয়ে যায়। ভাগ্য প্রসন্ন তাই নদী শান্ত। নইলে পায়ে হেঁটে নতুন জিপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ত।

"আর একবার ভেবে দেখো কিম। তোমার আট হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত ট্রেক করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। K2 কিন্তু অনভিজ্ঞ পর্বতারোহীদের জন্য নয়। ইনফ্যাক্ট আমি মনে করি মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের পরেই K2 জয়ের সাহস দেখানো উচিত। এ পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শৃঙ্গ। চার জন সফল পর্বতারোহীর মধ্যে একজনের মৃত্যু এখানে অনিবার্য।"

কিম উইলিয়ামের আরও ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে কাঁধে মাথা রাখল।

"ভয় পেও না জন। আমি ঠিক পারব। আমাকে পারতেই হবে। আমার সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে গাইড করবে। এরপরও কি আমার ভয় পাওয়ার

কোন কারণ আছে জন!"

জন মাথাটা একটু হেলিয়ে বলল, "আছে কিম। আট হাজার ফিট উচ্চতায় কেউ কারো নয়। ডেথ জোনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু যখন হাতছানি দেয় তখন মানুষের কোন হুঁশ থাকে না। তুমি জানো না। কিন্তু আমি জানি। ২০০১-এ এই শৃঙ্গেই আমি মৃত্যুকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। তুমি অনুভব করতেও পারবে না কিম যখন মৃত্যু শিওরে এসে দাঁড়ায় তখন নিজেকে কত অসহায়, কত নিঃসঙ্গ মনে হয়!"

"তবুও তো তুমি বারবার জীবনের ঝুঁকি নাও! কেন বলতে পারো!"

"এ এক নেশা! যাকে পায় তার মুক্তি নেই!"

"জানো জন আমি আজও চোখ বুজলে মা-বাবার ভাসা ভাসা মুখ দেখতে পাই! অথচ কতই বা ছিল আমার বয়স বলো! আট বছর, মাত্র আট বছরে মা-বাবা আমায় ছেড়ে যায়। দিদিমার বুকে মুখ রেখে তাদের শৃঙ্গ জয়ের গল্প শুনতাম। তখন থেকেই স্বপ্ন দেখি, মা-বাবা যেন দুই হাত প্রসারিত করে আমায় ডাকছে। সাদা বরফে ঢাকা এক স্বর্গ রাজ্য। আমি ছুটে চলেছি তাদের পানে। ঝাঁপিয়ে পড়ছি তাদের বুকে। কী শীতল সে আলিঙ্গন! মৃত্যুর মতই শান্ত, সুন্দর।"

একটু থেমে কিম আবার বলতে শুরু করে। আবেগে ভারী হয়ে আসে তার গলা।

"সেই টানেই তোমার কাছে ছুটে যাওয়া! মনে হয়েছিল তুমিই আমায় পৌঁছে দিতে পারো সেই স্বর্গ রাজ্যে, যেখানে আজও আমার মা-বাবা আমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে!"

"আসকোলে আ গেয়া সাহাব।" ড্রাইভারের গলা শুনে ছেদ পড়ল কথোপকথনে। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল কিম। তিন হাজার মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পাথুরে পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা ছবির মত সুন্দর এক গ্রাম আসকোলে। উইলিয়াম জিপ চালককে টাকা মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল বেস ক্যাম্পের দিকে।

বেশ ভিড় এখানে। বছরে মাত্র দুমাস সময় গডউইন অস্টিনকে (K2) জয় করার। শীতকালে এই শৃঙ্গ জয়ের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। জুলাই-আগস্ট জুড়ে তাই K2 জয়ের স্বপ্ন বুকে নিয়ে দেশ বিদেশ থেকে পাহাড় চড়ার নেশায় মত্ত মানুষ ছুটে আসে এখানে। পৃথিবীর সকল পর্বতারোহীর স্বপ্ন জীবনে অন্তত একবার এই শৃঙ্গকে জয় করার। কত সফল সুদক্ষ পর্বতারোহী এই নেশায় প্রাণ দিয়েছে তার হিসাব নেই। নামেই পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ, কিন্তু আসলে একে জয় করা মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও কঠিন। উচ্চতা ৮৬১১ মিটার, যা আদতে মাউন্ট এভারেস্টের থেকে মাত্র ২৩৭ মিটার কম।

বেস ক্যাম্প জুড়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁবু পোঁতা হয়েছে।